অনুবাদসমগ্র

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ঐতিহ্য

সদরুল আমিন

ও

নাফিসা জামাল

প্রীতিভাজনেষু

মু খ ব ন্ধ

অনুবাদসমগ্রর এই চারটি বই সাহিত্য এবং সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। অনুবাদের কাজটা আমি করেছিলাম বিভিন্ন সময়ে। হোমারের *অডিসি*র ঘটনাটা ঠিক অনুবাদ নয়, কিশোরদের উপযোগী করে মূল কাহিনীর বাংলায় উপস্থাপন। ইংরেজীতে *পোয়েটিকস* নামে পরিচিত এরিস্টটলের মূল্যবান রচনাটির অনুবাদ করা হয়েছে ভূমিকা এবং টীকা সহ। *কাব্যের স্বভাব* কবি ও সাহিত্যতাত্ত্বিক এ ই হাউসম্যানের *দি নেইম অ্যান্ড নেচার অব পোয়েট্রি* নামের গুরুত্বপূর্ণ একটি তাত্ত্বিক বক্তৃতার অনুবাদ। পাঠকের সুবিধার জন্য এটিতেও ভূমিকাসহ টীকা সংযুক্ত করা হয়েছে। শেষ গ্রন্থটি লেখক হেনরিক ইবসেন; অনুবাদ করা হয়েছে নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ থেকে। ইংরেজীতে নাটকটির নাম *দি ওয়াইল্ড ডাক,* বাংলাতে দাঁড়িয়েছে *বুনো হাঁস*।

অনূদিত চারটি রচনার ভেতর বিষয়বস্তুর এবং উপস্থাপনার দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে; কিন্তু সবকটিই উচ্চ সাহিত্যিক মূল্যসম্পন্ন রচনা। এদের পাঠকদের ভেতর ভিন্নতা থাকা সম্ভব, কিন্তু সাহিত্যনুরাগীদের জন্য চারটি গ্রন্থই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই বিবেচনা থেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমি অনুবাদের কাজটি করেছিলাম।

চারটি রচনারই প্রথম প্রকাশক বাংলা একাডেমী। সেকালে বাংলা একাডেমী অনুষ্ঠান কম করত, প্রকাশনা করত বেশী। *হোমারের অডিসি*র প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫-তে, *এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের* ১৯৭৫-এ, হাউসম্যানের *কাব্যের স্বভাব*-এর ১৯৮৫-তে এবং ইবসেনের *বুনো হাঁস*-এর ১৯৫৬-তে। এরপরে এদের প্রত্যেকটিই নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অন্য প্রকাশকরা করেছেন। কিন্তু সবকয়টিকে মিলিয়ে একসঙ্গে প্রকাশ এই প্রথম। এর জন্য কৃতিত্বের যদি কিছু থাকে তবে তার সবটুকুই প্রাপ্য আমার দুজন আপনজনেরই; একজন হচ্ছে, কবি ও সাহিত্যানুরাগী পিয়াস মজিদ, অপরজন ঐতিহ্যের উৎসাহী প্রকাশক আরিফুর রহমান নাইম। তাদেরকে ধন্যবাদ।

সিইচৌ
০১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫

অনুবাদ-সূচি

হোমারের অডিসি ১১
ইবসেনের
বুনো হাঁস ১৬৯
এ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব ৩০৯
হাউসম্যানের কাব্যের স্বভাব ৪১১

হোমারের অডিসি

কিশোরোপযোগী বাংলা রূপান্তর

ভূমিকা

হোমার হচ্ছেন পৃথিবীর আদি কবিদের একজন। অসাধারণ রকমের দক্ষ ছিলেন তিনি গল্প বলায়। তাঁর মহাকাব্য 'অডিসি' গল্প বলার সেই দক্ষতারই একটি জীবন্ত প্রমাণ। 'অডিসি'র গল্প এমন ঘটনাবহুল ও নাটকীয় যে একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা কঠিন। পড়ার সময় আমাদের কৌতূহল জেগে থাকে, আমরা জড়িয়ে পড়ি ঘটনার সঙ্গে, জানতে চাই তার পরে কী হলো, উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠি অডিসিয়ুস তাঁর বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন কি-না তা ভেবে। সব মহাকাব্যেই গল্পের সঙ্গে ছবি থাকে গল্পের মানুষদের, পরিবেশ ও প্রকৃতির, চিন্তার ও বিশ্বাসের, আচার-আচরণের; 'অডিসি'তেও আছে। গল্প আছে, আর গল্পের ভেতর দিয়ে শিরা-উপশিরার মতো বয়ে গেছে হোমারের কালের মানুষের জীবন কেমন ছিল তার একটি ছবি।

'অডিসি'র অনুবাদ পৃথিবীর নানা দেশে হয়েছে। আমাদের এ-বইতে কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে বাংলায় ঠিক অনুবাদ নয়, একটি রূপান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে। এই রূপান্তর বিশেষভাবে কিশোরদের উপযোগী করে তৈরি। মূল 'অডিসি'র কিছু কিছু অংশ এতে নেই। কালজয়ী সাহিত্যের যে-পাঠ তার তো কোনো শেষ নেই, তাই এই রূপান্তর পাঠকদেরকে যদি হোমারের অন্য মহাকাব্য 'ইলিয়াড' এবং সেই সঙ্গে অন্য লেখকদের লেখা কালজয়ী সাহিত্য পাঠে আরো বেশি উৎসাহী করে তোলে তবে তা খুশির কারণ হবে।

পূর্বকথন

অডিসিয়ুস যুদ্ধে গিয়েছিলেন। সেই যে ট্রয়ের যুদ্ধ, এক দিন নয়, দু'দিন নয়, একটানা চলেছিল দশ বছর– সেই যুদ্ধ। অডিসিয়ুসের মোটেই ইচ্ছে ছিল না যুদ্ধে যাওয়ার। কাপুরুষ ছিলেন যে তা নয়, সাহস ছিল খুবই, বীরের মতো বীর ছিলেন তিনি– অন্যরা যেখানে পিছিয়ে আসত সেখানে এগিয়ে যেতেন নির্ভয়ে। অডিসিয়ুস খুব বিচক্ষণও ছিলেন, যুদ্ধে তাঁর কোনোই আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন ইথাকার রাজা। ছোট্ট দ্বীপ ইথাকা, মূল গ্রিস দেশের পশ্চিমে, পানির মধ্যে ভাসছে। সেই ইথাকাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন অডিসিয়ুস। আর ভালোবাসতেন তাঁর স্ত্রী ও তাঁর শিশু সন্তানকে। ইথাকা ছেড়ে, পরিবার ছেড়ে কোথায় সেই ট্রয়, সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করবেন এই ইচ্ছে তাঁর মোটেই ছিল না।

কিন্তু তবু যেতে হয়েছে। ট্রয়ের যুদ্ধের ব্যাপারটা জানো তো বোধ হয়? ট্রয়ের এক রাজকুমার, নাম তার প্যারিস, তিনি এসেছিলেন মেনেলাউসের রাজ্যে। মেনেলাউস ছিলেন স্পার্টার রাজা। সেকালের গ্রিকরা ছিল অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। গ্রিক রাজা মেনেলাউস খুব সমাদর করলেন প্যারিসের। প্যারিস বেশ কিছুদিন রইলেন স্পার্টার রাজপ্রাসাদে। রাজা মেনেলাউসের কাজ পড়েছিল বাইরের এক দেশে, তিনি প্যারিসকে রেখেই চলে গেলেন বাইরে। ফিরে এসে শোনেন– প্যারিস চলে গেছেন, আর যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে গেছেন স্পার্টার রানি হেলেনকে। এই খবর যখন জানাজানি হলো চারদিকে তখন সাজ সাজ রব। গ্রিক রাজারা সব তৈরি হলেন, ডাক পড়ল সৈন্যদের, বোঝাই হলো যুদ্ধ-জাহাজ। এক হাজার যুদ্ধ-জাহাজ রওয়ানা হলো ট্রয়ের দিকে। হেলেনকে তো উদ্ধার করতেই হবে, সেই সঙ্গে উচিত শিক্ষা দিতে হবে ট্রোজানদের।

অডিসিয়ুস তো গ্রিক রাজাদেরই একজন। তাঁরও যাওয়ার কথা যুদ্ধে। কিন্তু আগেই বলেছি, তাঁর মোটেই ইচ্ছে ছিল না যাওয়ার। যুদ্ধে যাওয়া এড়ানোর জন্য তিনি রটিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি পাগল হয়ে গেছেন। মেনেলাউসের দূত যখন এলো তাঁর খোঁজে তখন তিনি দিব্যি পাগল সেজে বসে আছেন। কিন্তু তবু ধরা পড়ে গেলেন যে পাগল হননি, পাগল সেজেছেন মাত্র। বাধ্য হয়ে তাঁকেও যেতে হলো যুদ্ধে।

সেই যুদ্ধ একটানা দশ বছর চলল। হাজার হাজার গ্রিক সৈন্য এসে নেমেছে ট্রয়ের বাইরে। কিন্তু তারা ঢুকতে পারেনি ভেতরে। কেননা ট্রয় নগর ছিল চারদিকে খুব শক্ত এক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। যুদ্ধ চলল প্রাচীরের বাইরে। ট্রোজানরাও কিন্তু কম সাহসী ছিল না। তারাও লড়ল প্রাণপণে, খুব সাহসের সাথে। দিনের পর দিন যুদ্ধ চলছে, লোক মারা যাচ্ছে উভয় পক্ষে, কখনো আসছে আশা কখনো হতাশা। ক্ষয়-ক্ষতির শেষ নেই, ত্যক্ত-বিরক্ত উভয় পক্ষই, কিন্তু তবু এই যুদ্ধে জয়-পরাজয় নেই। বুঝি অনন্তকাল চলবে এই লড়াই।

আসলে ব্যাপার কী জানো? এই যুদ্ধে জড়িত ছিলেন দেবদেবীরাও। তাঁরা ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিলেন এপক্ষে ওপক্ষে। সাহায্য করছিলেন নিজ নিজ পক্ষকে, শত্রুতা করছিলেন বিপক্ষের সঙ্গে, তাঁরাই শেষ হতে দিচ্ছিলেন না এই যুদ্ধ। এমনও অবস্থা হয়েছে যে, দেবদেবীরাও নিজেরাই যুদ্ধ করেছেন এপক্ষে ওপক্ষে। আর দেবদেবীদের তো মৃত্যু নেই, তাঁরা তো ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণও করে দিতে পারেন নিজের নিজের সমর্থকদের। যুদ্ধ তাই শেষ হচ্ছিল না কিছুতেই।

দেবদেবীরা অবশ্য সত্যি সত্যি ছিলেন না। কেউ তাঁদের দেখেনি। সবটাই কল্পনার ব্যাপার।

ট্রয়ের যুদ্ধের এবং যুদ্ধ শেষে গ্রিক বীরদের দেশে ফেরার যে গল্প তা আমরা প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য থেকেই পাই। এই সাহিত্য লেখা হয়েছে যীশু খ্রিষ্টের জন্মেরও ধরো গিয়ে হাজারখানেক বছর আগে। খ্রিষ্ট জন্মেছিলেন এখন থেকে দু হাজার বছর আগে, সেই হিসাবে এসব গল্পের বয়স হবে তিন হাজার বছর। আর গল্পের ঘটনাগুলো যে সময়ে ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা তো হলো গিয়ে আরো আগের। সেই সময়ে যখন আজকের দিনের জ্ঞান ছিল না মানুষের, বিজ্ঞান ছিল না তার আয়ত্তে, তখন মানুষ বিশ্বাস করত এইসব দেবদেবীতে। দেবদেবীরা সবাই কাল্পনিক। কিন্তু গ্রিকদের পক্ষে এই কল্পনার দরকার ছিল। তা না হলে তারা চারপাশে যেসব ঘটনা দেখছে সেগুলোর ব্যাখ্যা করবে কী করে? যেমন ধরো সূর্য। এই যে সূর্য প্রতিদিন সকালে ওঠে, আবার সন্ধ্যায় অস্ত যায়, তারপর আবার পরদিন সকালে ফেরত আসে হাসতে হাসতে– এগুলো কেমন করে ঘটে? সমুদ্রে কেন ঝড় ওঠে? আকাশে কেন বজ্রের গর্জন? মানুষ মরলে পরে কোথায় যায়? এ-সব ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানা ছিল না তাদের। তারা মনে করত এই সবকিছুই দেবদেবীদের কাজ অথবা কারসাজি। তাছাড়া মানুষ যখন বিপদে পড়ে, আশা থাকে না, আশ্রয় জোটে না– তখন সে কার কাছেইবা সাহায্য চাইবে, কার ওপরেইবা নির্ভর করবে– যদি দেবদেবীরা না থাকেন?

গ্রিকদের দেবদেবীরা কিন্তু ছিলেন মানুষের মতোই। মানুষের মতোই রাগ ছিল তাঁদের, ছিল ভালোবাসা। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁদের। এমনকি দেখতেও মানুষের মতোই। ছদ্মবেশে মানুষ সেজে এসে সাহায্য করতেন মানুষকে, বিপদেও

ফেলতেন দরকার মনে করলে। যুদ্ধের মধ্যেও তাঁরা জড়িয়ে পড়তেন। আসল ব্যাপার তো বুঝতেই পারছো, কল্পনা করা হতো যে তাঁরা জড়িয়ে পড়েছেন। নইলে ওই যে যুদ্ধে কখনো এই পক্ষ জিতছে কখনো ওই পক্ষ, সেই হার-জিতের ব্যাখ্যা কী? ওই যে যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ অন্ধকার নেমে এলো– তার কারণ কী? আর ওই যে সবচেয়ে নির্ভুল তীরন্দাজের তীরটি তার লক্ষ্য ভেদ করছে ঠিকই, কিন্তু কোনো ক্ষতি করতে পারছে না– এরই বা রহস্য কী? নিশ্চয়ই পেছনে আছেন কোনো দেবতা অথবা দেবী।

গ্রিকদের কল্পনাশক্তি ছিল অসাধারণ। তারা তাদের দেবদেবীদের স্বভাব- চরিত্র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এমনসব কাহিনি তৈরি করেছে যার কোনো তুলনা নেই। মানুষের কল্পনাশক্তি কেমন সাহসী অথচ যুক্তিসম্মত হতে পারে তার একটি জীবন্ত দলিল এসব কাহিনি। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ কাহিনিগুলো শুনে আনন্দ পেয়েছে, এখনো পাচ্ছে। দেবদেবীরা ছিলেন না, কিন্তু যদি তাঁরা থাকতেন সত্যি সত্যি, তাহলে তাঁরা ওই রকমেরই ব্যবহার করতেন যেমনটি করেছেন গ্রিক গল্প-কাহিনিতে। একেবারেই মানুষের মতো ব্যবহার।

ট্রয়ের সেই অতিশয় দীর্ঘ, অত্যন্ত বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অডিসিয়ুস যোগ দিয়েছিলেন, অন্যান্য গ্রিক বীরদের মতোই। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন। যুদ্ধে যেতে চাননি ঠিকই, কিন্তু যাওয়ার পর মোটেই পিছিয়ে আসেননি। অত্যন্ত সাহসী ছিলেন তিনি। অবশ্য তাঁর মতো সাহসী বীর আরো দু-চারজন ছিলেন গ্রিকদের মধ্যে। যেখানে তিনি অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন যেটা দিয়ে সেটা হলো গিয়ে তাঁর বিচক্ষণতা। বিপদে অডিসিয়ুস অধীর হননি, আশা ছাড়েননি কোনো সময়েই। কোন অবস্থায় কী করা ঠিক হবে সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। আর ছিল উদ্ভাবনশীলতা।

এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে একটা উদাহরণ দিলে। ট্রয়ের ঘোড়ার কথা শুনেছো কি? সেটি ছিল একটা কাঠের ঘোড়া। যে সে ঘোড়া নয়, মস্ত একটা ঘোড়া, এমনি ঘোড়ার চেয়ে অনেক অনেক বড়। সেই ঘোড়াটা তৈরি হয়েছিল অডিসিয়ুসের বুদ্ধিতেই। আসল বুদ্ধি অবশ্য ঘোড়া তৈরিতে নয়, ঘোড়ার ব্যবহারে।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম : সেই যে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চলছে তো চলছেই, শেষ নেই মনে হয়, তাতে গ্রিকরা ভীষণ অস্থির ও বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। তারা এসেছে নিজেদের দেশ ছেড়ে। অল্প দিনে যুদ্ধ শেষ হবে, শেষ হলেই যে যার ঘরে ফিরে যাবে– এই রকম আশা নিয়ে। এখন দেখছে শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণই নেই। বোঝা গেল যে, ট্রয়ের ভেতরে যদি ঢোকা না যায় তবে যুদ্ধের মীমাংসা হবে না কিছুতেই। যুদ্ধ তো হচ্ছে প্রাচীরের বাইরে, তাতে লোক মারা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু নগর তো ঠিকই থাকছে, নগরের মানুষদেরও জীবন এক রকম চলেই যাচ্ছে, হয়তো তারা আশা করছে গ্রিকরা একদিন বিরক্ত হয়ে, তাঁবু গুটিয়ে, জাহাজ ভাসিয়ে দেশে ফিরে যাবে। কাজেই সব কথার বড় কথাটা হলো ওই নগরের ভেতরে ঢুকতে হবে, যুদ্ধকে নিয়ে যেতে হবে নগরের ভেতরে। কিন্তু সেটা তো কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

নগরের ওই প্রাচীরও কিছুতেই ভাঙ্গে না। ওটা টপকে ঢুকতে গেলে ট্রোজানরা বাধা দিয়ে হটিয়ে দেয়। অথচ ট্রোজানদের শাস্তি না দিয়ে, রানি হেলেনকে ফেরত না নিয়ে গ্রিকরা দেশে ফিরেইবা যায় কী করে? এত বছর যুদ্ধ করার পর তাদের মানসম্মান থাকে কোথায়? মুখ দেখাবে কী করে তারা দেশবাসীকে বা নিজেদেরকেই? অতএব যে করেই হোক, ঢুকতে হবে ট্রয় নগরের ভেতরে, ঢুকে ধ্বংস করে দিতে হবে ওই নগরী, ছিনিয়ে নিতে হবে হেলেনকে।

আর এইখানেই এলেন অডিসিয়ুস। এলো তাঁর উদ্ভাবনী বুদ্ধি। তিনি তৈরি করলেন ওই কাঠের ঘোড়া। তারপর সেই ঘোড়ার ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি নিজে, সঙ্গে নিলেন বাছা বাছা কিছু যোদ্ধা। সকলে যেতে চায় না, ভয় পায়। তা কাজটা ভয়ের ছিল বৈকি, খুবই ভয়ের ছিল। কিন্তু অডিসিয়ুস যখন বললেন তিনি নিজে যাবেন সবার আগে, তখন অন্যরাও এলো এগিয়ে।

ট্রোজান পাহারাদাররা একদিন দেখে, আশ্চর্য ব্যাপার। গ্রিকরা তাঁবু ভেঙে ফেলেছে, তাঁরা জাহাজে গিয়ে উঠেছে। তারপর তাঁরা জাহাজ ছেড়ে চলেও যাচ্ছে। কিন্তু পিছনে ফেলে গেল তারা অদ্ভুত এক ঘোড়া। কাঠের তৈরি। একেবারে জীবন্ত সেই ঘোড়া। মস্ত বড় দেখতে। সাহস করে এলো তারা ঘোড়ার কাছে। ঘোড়াটার পিঠে হাত বোলায় আর ভাবে– নিয়ে যাই ভেতরে। দেখুক নগরের সবাই। সেই ভেবে আরো অনেক লোকে মিলে টানতে টানতে সেটাকে নিয়ে গেল নগরের ভেতরে। নগরের দরজা দিয়ে ঘোড়া ঢুকতে চায় না, সেই জন্য দরজা ভেঙ্গে বড় করতে হলো।

রটে গেল যে গ্রিকরা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে। আর যাওয়ার সময় ফেলে গেছে আশ্চর্য এক ঘোড়া। এই খবর শুনে ট্রয়বাসীদের সে কী উল্লাস! দশ বছর যুদ্ধ করে তারাও ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন এ কী সুসংবাদ? সেই রাতে উৎসবের ধুম পড়ে গেল ট্রোজানদের মধ্যে। তারা হৈ-হুল্লোড় করল, নাচল, গাইল, খেল, তারপর ক্লান্ত হয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘোড়ার ভেতরে চুপচাপ বসে ছিলেন অডিসিয়ুস ও তাঁর সঙ্গীরা। তাঁরা তো অপেক্ষা করছিলেন এই সুযোগের জন্যই। গভীর রাতে তাঁরা বেরিয়ে এলেন। এসে নগরীর দরজা দিলেন খুলে।

ওদিকে গ্রিকরা কিন্তু চলে যায়নি, তারা শুধু ভান করেছিল চলে যাওয়ার। রাতের বেলায় তারা ঠিকই ফিরে এসেছে ট্রয়ের উপকূলে। তারপর জাহাজ থেকে নেমে দলে দলে ঢুকে পড়ল নগরের ভেতরে। বাধা দেবে কে? ট্রোজানরা তো তখন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে। গ্রিকরা করল কী, নগরে দিল আগুন লাগিয়ে। ঘুম ভেঙে আতঙ্কিত নগরবাসী এ ওর দিকে চায়, বুঝতে পারে না কী হচ্ছে। তারা দৌড়ে বের হয়েছে রাস্তায়।

গ্রিকরা তো এটাই চাইছিল। তারা দাঁড়িয়ে ছিল তলোয়ার খুলে, বর্শা উঁচিয়ে। যাকেই হাতের কাছে পেল, খুন করল। বাদ দিল না কাউকেই– বৃদ্ধ নয়, শিশু নয়।

ট্রোজানরাও বীর জাতি। যখন বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী, তখন তাদের কেউ কেউ রুখে দাঁড়াল, বাধা দিল, যুদ্ধ করল, হত্যা করল। কিন্তু তারা সংগঠিত নয়, তাদের নগর জ্বলছে, তারা পারবে কেন প্রস্তুত গ্রিকদের সঙ্গে? একে একে তারা সবাই প্রাণ দিল। শেষ হয়ে গেল ট্রয়। প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল তার বসতি। গ্রিকরা এমন নিষ্ঠুরতা দেখাল যে এমনকি তাদের পক্ষের দেবদেবীরাও রাগ করলেন, বিরুদ্ধে চলে গেলেন তাদের।

এভাবেই শেষ হলো ট্রয়ের যুদ্ধ। অডিসিয়ুসের বুদ্ধিটা দেখলে তো! ওই বুদ্ধি না-থাকলে ট্রোজানদের হারানো যেত না কিছুতেই।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবার ঘরে ফেরার পালা। যে যার দল নিয়ে জাহাজ ছাড়লেন। অডিসিয়ুসও রওয়ানা দিলেন ইথাকামুখো। বারোটি জাহাজ একসঙ্গে ভাসালেন তিনি। তাঁর একটিই লক্ষ্য, ইথাকা। যেখানে তাঁর স্ত্রী আছেন, পেনিলোপি যাঁর নাম, যেখানে তিনি শিশু-পুত্রকে রেখে এসেছেন, নাম যার টেলেমেকাস। তারা কেমন আছে কে জানে, দশ বছর তাদের দেখেন না তিনি, খবরও পান না তাদের বিষয়ে।

রওয়ানা তো হলেন, কিন্তু তিনি কি জানতেন যে দেশে ফিরতে তাঁর একদিন দু'দিন নয়, সময় লাগবে দশ দশটি বছর? এ তো যুদ্ধ শেষ করেও আরেক যুদ্ধ শুরু। এই যুদ্ধও সেই দশ বছরেরই। কিন্তু মানুষের সঙ্গে নয়। এখানে শত্রু হচ্ছে প্রকৃতি, শত্রু হচ্ছে দেবদেবী, দৈত্য ও ডাইনি। কত রকম যে বিপদ এলো তার হিসাব রাখাই কঠিন। সমুদ্র কাঁপিয়ে এলো ঝড়, আকাশ চিরে বজ্র। কোথাও দৈত্য ধরেছে, চিবিয়ে আস্ত খেয়ে ফেলবে বলে, কোথাও দেবী আটক করেছেন মানুষকে, কোথাওবা আছে এমন মধুর ফুল যে খেয়েছো কি খাওনি সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ভুলে যাবে তুমি। ওঁত পেতে বসে আছে ঘূর্ণিচক্র, তারই পাশে দস্যুর মতো দাঁড়িয়ে ভয়ংকর পাহাড়। মানুষখেকোদের দেশে গিয়ে পড়তে পার। হয়তোবা পড়বে এমন ডাইনির খপ্পরে যারা পাখি সেজে বসে আছে গান শোনাবে বলে। সেই গান সারা জীবন ধরে শুনবে তুমি, শুনতে শুনতে শুকিয়ে যাবে, শুকোতে শুকোতে মরবে, তবু তোমার নিস্তার নেই।

এইসব বিপদে সাহস ও ধৈর্যের পরীক্ষা হয়েছে অডিসিয়ুসের। সঙ্গীরা মারা গেছে একের পর এক। ডুবে গেছে জাহাজ। ভেসে গেছে প্রিয় বন্ধু। শত্রুতা ছিল প্রকৃতির। শত্রুতা করেছে সঙ্গীদের বোকামি, কৌতূহল ও লোভ। কিন্তু তবু অধৈর্য হননি এই বীর। সাহস হারাননি কখনো। আর যে তাঁর বিখ্যাত উদ্ভাবনশক্তি, যা দিয়ে তিনি ট্রোজানদের শায়েস্তা করেছিলেন সেই শক্তি ব্যবহার করতে কখনই ভুল হয়নি তাঁর। সবার উপরে ছিল বাড়ি ফেরার আশা। কখনো, কোনো অবস্থাতেই বাড়ি ফেরার কথাটা ভোলেননি তিনি। চুম্বক লোহাকে যেমন নিজের দিকে টেনে নেয় তেমনই ইথাকা টেনেছে অডিসিয়ুসকে। ঘর ছেড়ে যেতে চাননি তিনি, আজ ঘরে ফেরার জন্য উতলা তাঁর মন।

শেষ পর্যন্ত ফিরেছেনও। না, সঙ্গীরা কেউ ফেরেননি, সবাই হারিয়ে গেছেন পথে। শুধু অডিসিয়ুস, একাকী অডিসিয়ুস ফিরে এসেছেন ইথাকায়। যুদ্ধ শেষের দশ বছর পরে।

কিন্তু এ কোন দেশে এলেন তিনি? এখানে তো কেউ তাঁকে চেনে না। না, চেনার কথা তো নয়। বিশ বছরে তিনিও বদলেছেন, লোকেরাও বদলেছে। রাজার বেশে তো তিনি ফেরেননি ইথাকায়, ঢাক-ঢোল বাজেনি, ফিরেছেন সবকিছু হারিয়ে, একেবারে একাকী। গোপনে গোপনে। তাছাড়া ইথাকায় তখন রাজা নেই। কাজেই দেশে নানা রকমের বিশৃঙ্খলা।

এই বিশ বছরে রাজবাড়ির ওপর দিয়ে মস্ত এক ঝড় বয়ে গেছে। সবাই ধরে নিয়েছে যে এতদিন যখন ফিরেননি তখন রাজা নিশ্চয়ই আর বেঁচে নেই। এই সুযোগে রাজ্যের তো বটেই, আশেপাশের রাজ্য থেকেও শ'খানেক 'পাত্র' এসে উৎপাত শুরু করেছে রাজপ্রাসাদে। পাত্রই বলতে হয় তাদেরকে। কেননা তাদের সকলের মুখে ওই এক কথা। রাজা তো আর বেঁচে নেই, রানি এখন বিধবা। তিনি আমাদের যে-কোনো একজনকে বিয়ে করুন। এই পাত্ররা একা আসেনি। সঙ্গে এসেছে বন্ধুবান্ধব, চাকরবাকর। সবাই মিলে রাজার বাড়িতে থাকছে, খাচ্ছে, হৈ-হুল্লোড় করছে। তাদের ফুর্তির আর অন্ত নেই। সেই যে শিশু-সন্তান অডিসিয়ুসের সেই টেলেমেকাসও বড়সড় হয়েছে এখন, কিন্তু তার মনে এতটুকু শান্তি নেই, একে তো বাবার কোনো খবর নেই, ওদিকে ভাগ্যান্বেষী মানুষগুলো প্রতিদিন তাকে টিটকারি দিচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা অবশ্য গেছে রানি পেনিলোপির। পাত্ররা তাঁকে উত্ত্যক্ত করছে। তাঁর পক্ষে বলতে গেলে কেউই নেই। বাড়ির কাজের লোকেরাও একে একে হতাশ হয়ে ও লোভে পড়ে চলে গেছে বিপক্ষ দলে। গভীর সমুদ্রে স্বামী যখন লড়ছিলেন বিরূপ প্রকৃতি, ক্রুদ্ধ দেবতা ও ভয়ংকর সব দৈত্য ও ডাইনিদের বিরুদ্ধে, স্ত্রী তখন যুদ্ধ করছিলেন মানুষের শত্রুতার বিরুদ্ধে। ধৈর্য ও আশায় তিনিও কম যান না। তাঁরও আছে উদ্ভাবনশক্তি। তিনিও রটিয়ে দিলেন যে, বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্য কাফনের যে কাপড়টি তিনি বুনছেন সেটা বোনা শেষ হলে তবে তিনি পাত্রদের একজনকে বিয়ে করবেন। কিন্তু সেই কাপড় বোনা আর শেষ হয় না। হবে কী করে? দিনে তিনি কাপড় বোনেন, আর রাতে তা খুলে ফেলেন। এই করে করে ফাঁকি দিচ্ছিলেন। কেবলই সময় নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেই ফাঁকিটাও ধরা পড়ে গেল একদিন। ধরিয়ে দিল তাঁর বাড়িরই লোক।

এই রকম সময়ে গোপনে একাকী অডিসিয়ুস এসে হাজির হলেন ইথাকায়। পুত্র কিন্তু চিনল পিতাকে। পিতা-পুত্রে মিলে হত্যা করলেন ওই পাত্রদের। ভেঙে গিয়েছিল যে পরিবার সেটি আবার নতুন জীবন পেল।

২

অডিসিয়ুসের ঘরে ফেরার এই কাহিনি পাওয়া যায় হোমারের মহাকাব্য 'অডিসি'তে। হোমার হলেন আদি গ্রিক কবি। শুধু গ্রিসের নয়, পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে প্রাচীন কবি তিনি। একটি নয়, দু'টি মহাকাব্য রেখে গেছেন হোমার, প্রথমটির নাম 'ইলিয়াড', দ্বিতীয়টির নাম 'অডিসি'। 'ইলিয়াডে' আছে ট্রোজান যুদ্ধের কাহিনি, 'অডিসি'তে অডিসিয়ুসের ঘরে ফেরার গল্প।

কে ছিলেন এই কবি? না, তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। কবিতায় তিনি নিজের কথা প্রায় কিছুই বলেননি। শোনা যায় তিনি নাকি অন্ধ ছিলেন। নিজে অন্ধ অথচ যে-সব দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন তা সব সময়েই স্পষ্ট, যেন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। এর কারণ হলো এই যে, অসামান্য ছিল তাঁর কল্পনাশক্তি। যে-সব গল্প বলেছেন সেগুলো সব যে তাঁর নিজের তৈরি তা নয়। অনেকগুলোই অন্যের মুখে শুনেছেন হয়তো, হয়তোবা সংগ্রহ করেছেন স্মৃতি হাতড়ে। কিন্তু তিনি টুকরো টুকরো কাহিনিকে নিয়ে সুগঠিত কাহিনি গড়ে তুলেছেন। অসাধারণ ছিল তাঁর গল্প বলার ক্ষমতা। হোমারের মহাকাব্যে ঘটনাগুলো দ্রুত ঘটে যায়। তিনি খুব সোজা ভাষায় বর্ণনা দেন। ছবিগুলোতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। সেই জন্য তাঁর মহাকাব্য একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা খুব কঠিন।

হোমার কি একজন ছিলেন, নাকি অনেক ক'জন? এই প্রশ্নটা উঠেছে বিশেষ করে এই জন্য যে, একজন কবির পক্ষে এমন দু'টি আশ্চর্য মহাকাব্য রচনা করা সম্ভব কিনা তা নিয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি' দুটোই মহাকাব্য বটে, কিন্তু একটির সঙ্গে অপরটির বিস্তর ব্যবধান। সেই জন্যও প্রশ্ন : একই লোকের পক্ষে কি সম্ভব দু'রকম দু'টি মহাকাব্য লেখা?

দু'রকম যে সেই ব্যাপারে কতগুলো চিহ্ন আছে। যেমন ধরো, 'ইলিয়াডে'র বিষয় হলো যুদ্ধ আর 'অডিসি'র বিষয় দুঃসাহসিক অভিযান। 'ইলিয়াডে'র নায়ক একিলিস সহজেই রেগে যান, সহজেই হতাশ হন। 'অডিসি'র নায়ক অডিসিয়ুসের মেজাজ ঠাণ্ডা, আশাও খুব গভীর। 'ইলিয়াড' হচ্ছে রাজা-রাজড়াদের কাহিনি, সেখানে সাধারণ মানুষ নেই, 'অডিসি'তে আছে। 'অডিসি'র নায়ক সাধারণ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, সাধারণ মানুষও তাঁকে ভালোবাসে।

'ইলিয়াডে'র কাহিনি এক জায়গায় আবদ্ধ, 'অডিসি'তে কাহিনি কেবলই নতুন নতুন দেশে যাচ্ছে। হোমারের সময়ে যাকে আমরা উপন্যাস বলি তা লেখা শুরু হয়নি সত্য, উপন্যাস তো গদ্যে লেখা হয়, তবু 'অডিসি' যেন একটা উপন্যাস, কবিতায় লেখা উপন্যাস। যেখানে নানা রকম ঘটনা ঘটছে, বহু ধরনের চরিত্র আসছে, আর গল্পটা তরতর করে যাচ্ছে এগিয়ে।

হ্যাঁ, ব্যবধান আছে দুই মহাকাব্যে। কিন্তু বই দুটিকে যাঁরা খুঁটিয়ে পড়েছেন, দেখেছেন পরীক্ষা করে, তাঁরা বলেছেন, না, এই দুটি একই কবির রচনা। কল্পনার শক্তি ও বর্ণনার কৌশল দুটিতেই একই রকম। চিন্তা- ভাবনাগুলোও একই ধরনের।

ভাষাও মিলে যায়। তাই বলা হয় যে, হোমার একজনই, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ছিল বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার।

'অডিসি'র গল্পটা এখানে সংক্ষিপ্ত করে বলার চেষ্টা করব। অডিসিয়ুসের গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় মানুষের জীবনটা সত্যি সত্যি নানা রকম বিপদ-আপদে ভরা, কিন্তু সেইসব বিপদে উতলা হলেই আরো বেশি বিপদ। অডিসিয়ুস জয়ী হয়েছেন, কেননা কোনো বিপদেই তিনি উতলা হননি, সাহস রেখেছেন। আশা ছাড়েননি কখনো। আর ওই যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যকে ভোলেননি এক মুহূর্তের জন্যও। এক দেবী তো তাঁকে বলেছিলেনই, 'তুমি আমার সঙ্গে থাকো, তোমাকে অমর করে রাখব'। অডিসিয়ুস বলেছেন, 'না, আমি মানুষই থাকব।' মানুষের কাহিনি এটি। শত্রুর সঙ্গে সামনাসামনি লড়াইয়ের কাহিনি।

অডিসি

অডিসিয়ুসের সময় নেই।

তাঁকে ফিরতে হবে দেশে। মস্ত কোনো দেশ নয় ইথাকা। ছোট্ট একটা দ্বীপ মাত্র। আরো অনেক দ্বীপের একটি। শক্ত তার মাটি, কোথাওবা পাথুরে। কিন্তু সেই দ্বীপেই তাঁর পিতা আছেন, স্ত্রী আছেন, আছে তাঁর একমাত্র সন্তান। অডিসিয়ুসের মন পড়ে আছে সেইখানেই।

বারোটি জাহাজ একসঙ্গে ভাসল। বাতাস বইছিল চমৎকার। পাল তুলে ঘরমুখে চলেছে জাহাজগুলো। ভাসতে ভাসতে সিকোনিজদের নগর ইসমারসি- এ এসে পৌঁছলেন অডিসিয়ুস।

সবাই নামল এই দ্বীপে। খাদ্যের দরকার ছিল। যুদ্ধফেরত সৈনিকদের মনে দয়ামায়াটা বলতে কিছু কমই। তারা লুটতরাজ করল। সিকোনিজরা বাধা দিলে খুনখারাবি হলো বিস্তর। অডিসিয়ুসের খেয়াল ছিল জিনিসপত্রের ও খাবার- দাবারের ভাগাভাগিটা যাতে সমান সমান হয় সেদিকে। আরো খেয়াল ছিল তাড়াতাড়ি যাতে সরে পড়া যায় সেই ব্যাপারেও। কিন্তু সৈনিকদের তখন নেশায় পেয়েছে। তারা ভেড়া মারছে, গরু কাটছে। খাচ্ছে তারা মনের সুখে। যেন উৎসব লেগে গেছে। অডিসিয়ুসের কথা শোনার মতো অবসর নেই তাদের।

ওদিকে সিকোনিজরাও তো বসে ছিল না। চিৎকার তারা সমানে করছিল। কিছু লোক আবার ছুটে গেছে প্রতিবেশীদেরকে ডাকতে। এই প্রতিবেশীরা কিন্তু মোটেই নরম-সরম ছিল না। তারা ছিল লড়াকু। তাদের সংখ্যাও ছিল বেশি।

সকাল-হতে-না হতেই দেখা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে তারা এসেছে। শুরু হলো তাই ভীষণ এক যুদ্ধ। এপক্ষে ওপক্ষে কত যে বর্শা ছুটল তার কোনো হিসাবে নেই। সকাল গেল, দুপুর গেল– যুদ্ধ তবু চলছে। গ্রিকরা কোনো রকমে